



হিসাব মহা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ: উত্তরণের উপায়

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

দিপু রায়

১২ আগস্ট ২০১২

হিসাব মহা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ: উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা

অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ারম্যান, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

এম. হাফিজউদ্দিন খান
সদস্য, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

তত্ত্বাবধান

শাহজাদা এম. আকরাম, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি
মো. ওয়াহিদ আলম, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

দিপু রায়
প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা সহায়তায়

খোন্দকার ফাতেমা জারা
আব্দুস সাত্তার
দিলরুবা আফরোজ

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাড়ি # ১৪১, সড়ক # ১২, ব্লক # ই, বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮০-২-৮৮২৬০৩৬, ৯৮৮৭৪৯০
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সততা এবং নিরপেক্ষতা - এই মূল্যবোধগুলোর প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ থেকে তার সকল কার্যক্রম পরিচালনা করছে। টিআইবি দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট। গবেষণা, নাগরিক সম্পৃক্ততা, অ্যাডভোকেসিসহ নানা প্রচারণামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে টিআইবি একদিকে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, অন্যদিকে তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমকে জোরদার করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। টিআইবি তার এই অবস্থান থেকে জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ‘বাংলাদেশ হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক’ (সিজিএ)-এর কার্যালয়ে বিরাজমান সুশাসনের সমস্যা চিহ্নিত করা এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে এই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য হিসাবরক্ষণ ও আর্থিক বিবরণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সিজিএ কার্যালয় বাংলাদেশ সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাবরক্ষণ এবং এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি করে। প্রতিষ্ঠানটি সরকারি ব্যয়ের দুর্নীতি ও অপচয়ের বিরুদ্ধে এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ কৌশল এবং প্রহরী হিসেবে কাজ করার কথা। সিজিএ অর্থবছর ভিত্তিক হিসাব প্রতিবেদন বা বিবরণী তৈরি করে এবং তা মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি)এর অনুমোদন-সাপেক্ষে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে থাকে। অর্থ মন্ত্রণালয় এই হিসাবের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী বছরের আর্থিক পরিকল্পনা, বাজেট ব্যবস্থাপনা ও সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। গত কয়েক বছরে সিজিএ কার্যালয়ে হিসাবরক্ষণ স্বয়ংক্রিয় (অটোমেটেড) করার মত বহু ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হলেও জনবলের ঘাটতি, কর্মদক্ষতার ঘাটতি, আইনগত সীমাবদ্ধতা, মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ, অফিস স্থাপনা ও অন্যান্য লজিস্টিক সুবিধার ঘাটতিসহ বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়ম বিরাজমান থাকায় প্রতিষ্ঠানটি প্রত্যাশিত পর্যায়ের দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হচ্ছে না। সিজিএ কর্তৃক প্রদানকৃত প্রতিবেদন সময়মত না হওয়া ও সরবরাহকৃত তথ্য নির্ভরযোগ্য না হওয়ায় সরকারের আর্থিক পরিকল্পনা, বাজেট ব্যবস্থাপনা, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না, ফলে তা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত করে। সিজিএ’র ওপর প্রণীত গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে একটি দক্ষ ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে একে এগিয়ে নিতে সরকারসহ সব স্টেকহোল্ডারের সাথে সম্মিলিতভাবে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করতে টিআইবি আগ্রহী।

টিআইবি’র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের প্রোগ্রাম ম্যানেজার দিপু রায়ের নেতৃত্বে এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়। তথ্য সংগ্রহের কাজে তাকে সহায়তা করেছেন খন্দকার ফাতেমা জারা, আব্দুস সাত্তার ও দিলরুবা আফরোজ। এছাড়া তাকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন টিআইবি’র গবেষণা বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহজাদা এম আকরাম, মোহাম্মদ ওয়াহিদ আলম ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার মনজুর-ইখোদা। প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করতে টিআইবি’র গবেষণা বিভাগের সহকর্মীরা বিভিন্ন পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও স্বতঃস্ফূর্ত সহায়তা দিয়েছেন।

টিআইবি’র ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল ও সদস্য এম. হাফিজ উদ্দিন খান এর সার্বিক তত্ত্বাবধান ও পরামর্শের জন্য আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

সিজিএ অফিসের কর্মকর্তা ও সরকারি বিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বিভিন্ন সময়ে গবেষণা দলকে তথ্য দিয়ে সহায়তা করায় তাদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। গবেষণায় প্রাপ্ত প্রাথমিক ফলাফল নিয়ে সিজিএ অফিসের অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন, সিজিএ অফিস কর্মচারী কল্যাণ সমিতি ও সিজিএ চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় করা হয় এবং তাদের মূল্যবান মতামত নেওয়া হয়। তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মূল্যবান পরামর্শের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।

সিজিএ অফিসের সাথে সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারণকারী গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশের আলোকে সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই প্রতিষ্ঠানটির সমস্যা দূর করে একে আরও স্বচ্ছ, কার্যকর ও জবাবদিহিতাপূর্ণ করে তুলতে পারলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। এই প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে আপনাদের যে কোনো মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান

নির্বাহী পরিচালক

সার-সংক্ষেপ

১. ভূমিকা

একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অত্যন্ত জরুরি। আর সরকারি দায়-দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা হচ্ছে কিনা তা জনসম্মুখে প্রকাশের মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য হিসাবরক্ষণ ও আর্থিক বিবরণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সরকারি সম্পদের ব্যবহার এবং সরকারি অর্থ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ বণ্টনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে হিসাবরক্ষণ ও আর্থিক বিবরণী একটি পূর্ণ চিত্র প্রদান করে।

হিসাবরক্ষণ সরকারি ব্যয়ের দুর্নীতি ও অপচয়ের বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রণ কৌশল এবং প্রহরী হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশে সরকারি প্রতিষ্ঠানের হিসাবরক্ষণের দায়িত্ব পালন করে ‘হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক (সিজিএ) অফিস’। যেকোনো সরকারি বিল বা অর্থছাড় অনুমোদন করার পূর্বে তাতে কোনো প্রশাসনিক, আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতি হচ্ছে কিনা তা যাচাই করা এই অফিসের দায়িত্ব।

গত কয়েক বছরে সিজিএ অফিসে হিসাবরক্ষণ পদ্ধতির অটোমেশনসহ বিভিন্নরকম ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হলেও এর কিছু সমস্যা এখনো বিদ্যমান। এর মধ্যে জনবলের অভাব, তাদের কর্মদক্ষতার অভাব, আইনগত সীমাবদ্ধতা, কার্যক্রমে মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ, স্থাপনা ও লজিস্টিক সুবিধার অভাব উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের বিল পাস করাতে ঘুষ, হয়রানি, বিল হারিয়ে ফেলা, হিসাবের প্রতিবেদন তৈরিতে বিলম্ব ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দুর্নীতি রোধ এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বিভিন্ন ধরনের গবেষণার ভিত্তিতে সচেতনতামূলক প্রচারণা করে আসছে। এর ধারাবাহিকতায় টিআইবি ২০০৩ সালে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের (সিএজি) কার্যালয়ের ওপরে একটি তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। এই প্রতিবেদনে সিজিএ কার্যালয়ের সমস্যাগুলো বিস্তারিত আলোচিত হয়নি। এই প্রেক্ষিতে সিজিএ কার্যালয়ের সমস্যা নিয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য সিজিএ কার্যালয়ে সুশাসনের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশমালা প্রণয়ন করা। বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে (১) এই কার্যালয়ের নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনায় আইনগত, কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা চিহ্নিত করা, (২) এ কার্যালয়ে বিদ্যমান অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন, প্রক্রিয়া, কারণ ও প্রভাব চিহ্নিত করা, ও (৩) এ কার্যালয় যেন স্বচ্ছতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে তার জন্য সুপারিশ প্রদান করা।

১.২ গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাটি প্রধানত একটি গুণবাচক তথ্যভিত্তিক গবেষণা। এই গবেষণায় সিজিএ (সিভিল)-এর আইনি, কাঠামোগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও সেবা সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা (জিডি), পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা সম্পর্কিত বিদ্যমান নথি পর্যালোচনা।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, ডিজি অফিস, ডিপার্টমেন্ট ও বোর্ড, সরকারি কলেজ, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ মোট ৩০টি সরকারি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সিজিএ, সিএজি অফিসের প্রাক্তন ও বর্তমান কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ প্রায় ১৫০ জন মুখ্য তথ্যদাতার কাছ থেকে চেকলিষ্টের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন ওয়েবসাইট, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, সরকারি প্রকাশনা, সংবিধান, সিএজি ও সিজিএ প্রকাশনা, ম্যানুয়াল, সরকারের বিভিন্ন আদেশ ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ ও প্রবন্ধ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সেপ্টেম্বর ২০১০ থেকে মার্চ ২০১২ পর্যন্ত এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ করা হয়।

২. প্রতিষ্ঠান পরিচিতি ও আইনগত কাঠামো

১৯৪৭ সালে প্রাথমিকভাবে গঠিত হয়ে স্বাধীনতার পরে অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল - এজি (সিভিল), বাংলাদেশ নামে কাজ শুরু করে। সংবিধান অনুসারে সিজিএ সিএজির অধীনস্থ একটি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে সিজিএ অর্থ মন্ত্রণালয়েরও অধীনস্থ। সিজিএর কার্যাবলী ‘দি কম্পট্রলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪’, ‘দি কম্পট্রলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৫’, ‘কোড অফ অ্যাকাউন্টস’, ‘অডিট কোড’, ‘ট্রেজারি রুলস’, ‘জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস (জিএফআর)’, ‘বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস’, ‘সিজিএ ম্যানুয়াল’সহ অর্থ মন্ত্রণালয় ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন আদেশের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

সারা দেশে সিজিএ’র বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অফিস রয়েছে। এছাড়া সিজিএ’র নিয়ন্ত্রণে ঢাকায় মন্ত্রণালয় অনুসারে একটি করে প্রধান হিসাবরক্ষণ অফিস ও হিসাবরক্ষণের অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সিজিএ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ১৫টি বিভাগ রয়েছে। সারা দেশে সিজিএ’র মোট কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ৪,৮৮২ জন। সিজিএ উপযোজন ও আর্থিক হিসাবের প্রতিবেদন তৈরি করে সিএজি’র কাছে পাঠায়; সিএজি এই প্রতিবেদন অনুমোদনসহ সংসদে পেশ করে। নিরীক্ষাধীন অফিসসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার বিল, বেতন নির্ধারণ ও ছুটির হিসাব সংরক্ষণসহ সরকারের সকল ব্যয়ের বিল এই অফিসের মাধ্যমে পাশ করা হয়।

৩. আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা

সিজিএ যেসব আইন এবং বিধি-বিধানের মাধ্যমে পরিচালিত হয় সেসব আইন-কানুন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা থাকায় তারা অনেক সময় প্রয়োজনীয় সেবা দিতে ব্যর্থ হয়।

৩.১ আইনগত সীমাবদ্ধতা

ব্রিটিশ আমলের ট্রেজারি কোড, অ্যাকাউন্টস কোডের বিভিন্ন ভলিউম ও বাংলাদেশ সার্ভিস রুল অনুযায়ী সিএজি ও সিজিএ অফিসের কার্যক্রম পরিচালিত আইনসমূহের যুগোপযোগী সংস্কার না হওয়ায় ফলে বর্তমান পরিস্থিতিতে এগুলো মানতে গিয়ে দুর্নীতির সৃষ্টি হয় এবং কখনো কখনো কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যে পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার যোগ্য তার থেকে বেশি বা কম পায় কিংবা বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হয়। অন্যদিকে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত না হওয়া এবং আইনের ব্যাখ্যা সহজবোধ্য না হওয়ায় সরকারের বিভিন্ন বিভাগ একই আইনের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করে। তাই সরকারি কর্মকর্তারা তাদের জানা আইন অনুযায়ী কোনো কিছু দাবি করলে সিজিএ কর্মকর্তারা তা দিতে অপারগতা প্রকাশ করে। কোনো কোনো সিজিএ কর্মকর্তা আবার এই নানাবিধ আইনের মধ্যে তাদের স্বার্থ অনুযায়ী একেক সময় একেক রকম আইন অনুসরণ করেন। ফলে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা হয়রানির শিকার হয় এবং তাদের ন্যায্য দাবি থেকে বঞ্চিত হয়। আবার সরকারের যেসব প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নিয়ম-নীতি রয়েছে সেসব প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নিয়ম নাকি সরকারের সাধারণ নিয়ম কার্যকর হবে অর্থ মন্ত্রণালয় তা হালনাগাদ না করায় অডিট টিম ওই সব প্রতিষ্ঠানের নিয়ম না মেনে আপত্তি উত্থাপন করে। ফলে দীর্ঘ সময় ধরে অডিট আপত্তি মিটছে না এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীরা হয়রানির শিকার হচ্ছে।

৩.২ প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা

৩.২.১ প্রয়োজনীয় ও দক্ষ জনবলের অভাব

প্রয়োজনীয় ও দক্ষ জনবলের অভাব সিজিএ অফিসের সবচেয়ে বড় সমস্যা। বর্তমানে এ অফিসে ৩৭% পদ শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তারপদ শূন্য রয়েছে শতকরা ৪০.২৮ ভাগ এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর শতকরা ৩৬ ভাগ। প্রতি বছরই সরকারি বাজেটের পরিমাণ ও বিলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ এই বিল বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে সিজিএ অফিসের জনবল বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ফলে এই অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওপরে কাজের চাপ ক্রমাগত বেড়েই যাচ্ছে। প্রতিটি কেস, ফাইল, বিল আলাদাভাবে মূল্যায়ন করার মত প্রয়োজনীয়সংখ্যক দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন জনবল সিজিএ'র নেই। তাই এর কার্যক্রম দক্ষভাবে ও সময়মত পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ছে। জনবলের অভাবে সরকারি বিভিন্ন অফিসের কর্মচারীরা সিজিএ অফিসের কাজ করে। তারা রেজিস্টার খুঁজে সেখানে এন্ট্রি দেয় - এমনকি কম্পিউটারেও এন্ট্রি দেয়। এর ফলে অনেক সময় সঠিকভাবে কাজ সম্পন্ন হয় না। ভুল বা মিথ্যা তথ্য এন্ট্রি করে অতিরিক্ত অর্থ তুলে নিতে সক্ষম হয়। আবার ভুল বা মিথ্যা তথ্য এন্ট্রি করার কারণে হিসাবে গরমিল তৈরি হয়, যা যাচাই করে দেখার মত যথেষ্ট জনবল এখানে নেই।

৩.২.২ হিসাব সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব

সিজিএ অফিস যে হিসাব বিবরণী তৈরি করে তাতে প্রায়ই গরমিল দেখা দেয়। পূর্বের তুলনায় এই গরমিল কম হলেও এখনো কোড নম্বরের অমিল হওয়ার জন্য হিসাবে গরমিল হয়। হিসাবরক্ষণ করা সিজিএর প্রধান কাজ হলেও তারা বিল পাশ করার প্রতি বেশি আগ্রহী থাকে। প্রতি মাসের বিল পরবর্তী মাসে মিলিয়ে দেখার নিয়ম থাকলেও হিসাবরক্ষণ অফিসগুলোর অবহেলার কারণে তা করা হয় না। ফলে চূড়ান্ত হিসাব করার সময়ে ভুলগুলো ধরা পড়ে। যেকোনো হিসাবের বিশেষ করে উন্নয়ন বাজেটের টাকার হিসাব মেলানো না গেলেই তা অমীমাংসিত টাকা হিসেবে দেখানো হয়। এই অমীমাংসিত টাকার পরিমাণ কম (৩০-৪০কোটি) হলে বিষয়টি তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কিন্তু এই টাকার পরিমাণ ১০০ কোটি বা তার বেশি হলে, অর্থ মন্ত্রণালয় সিজিএ'কে অবশ্যই ডেবিট-ক্রেডিট মিলিয়ে দেওয়ার জন্য বলে। সেক্ষেত্রে গৌজামিল দিয়ে হিসাব মিলিয়ে দেওয়ার একটি প্রবণতা দেখা যায়। ফলে এই প্রতিবেদনে সরকারের আর্থিক অবস্থার সঠিক চিত্র না পাওয়ায় পরবর্তী বছরের বাজেট প্রণয়নে তেমন কোনো ভূমিকা পালন করতে পারে না।

৩.২.৩ সময়মত হিসাবের প্রতিবেদন সম্পন্ন না করা

হিসাবের প্রতিবেদন সময়মত তৈরি করার ওপরে নির্ভর করে সরকারের পরবর্তী বছরের সফল বাজেট প্রণয়ন। সিজিএ অফিস থেকে প্রতি অর্থবছরের উপযোজন ও আর্থিক হিসাবের প্রতিবেদন ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সিএজি বরাবর পাঠানোর নিয়ম রয়েছে। এরপরে সিএজি'র পক্ষ থেকে সিভিল অডিট বিভাগ কর্তৃক তা পরীক্ষা করা, ভুল সংশোধন করা ও সিএজি'র মন্তব্য নেওয়া পর্যন্ত সমস্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য পরবর্তী বছরের ৩০ মার্চ পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া রয়েছে। কিন্তু হিসাব প্রতিবেদনের গুণগত মান বজায় রাখা, সিএজির সিভিল অডিট বিভাগের কোনো তথ্য সম্পর্কে সন্তুষ্ট না হওয়া, প্রতিবেদন প্রকাশের নির্ধারিত সময়ের পর হিসাবের ভুল নিরূপণ ও প্রতিমাসে হিসাব করে ভুল চিহ্নিত না করা, বিদেশে বাংলাদেশের মিশনগুলোর হিসাব সময়মত না আসা এবং বিজি প্রেসের শিডিউল না পাওয়ার কারণে এই সময়সীমার মধ্যে প্রতিবেদনের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। ফলে এই হিসাবের বিবরণ বাজেট তৈরিতে তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না।

৩.২.৪ নিয়োগ, পদোন্নতি ও অর্গানোগ্রামে সমস্যা

২০০২ সালে সিএজি থেকে সিজিএ পৃথক হয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত নিয়োগ, পদোন্নতি, পদাধিকার ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বিষয়ে সিজিএ'র নিজস্ব কোনো বিধিমালা তৈরি হয় নি। সিজিএ'র প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও পদায়ন সিএজি'র মাধ্যমেই হয়; সিজিএ কেবলমাত্র তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করতে পারে। নিজস্ব নিয়োগ বিধি না থাকায় নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে কোনো শর্ত দিয়ে চাকরির বিজ্ঞাপন দিতে পারে না। এজন্য প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সিজিএ বাণিজ্য বা কম্পিউটার বিজ্ঞান থেকে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর জনবল নিয়োগ করতে পারছে না। ফলে সময়মত ও নির্ভুলভাবে কাজ সম্পন্ন হচ্ছে না। অন্যদিকে এ অফিসের নিয়োগ অর্থ মন্ত্রণালয় ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া সম্ভব নয়। প্রম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের নিয়োগের জন্য সিজিএ'কে সিএজি'র ওপরও নির্ভর করতে হয়। এদের পদায়ন, বদলি ও পদোন্নতিও সিএজিই করে থাকে। ১৯৮৩ সালের তুলনায় বর্তমানে সারা দেশে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা শতকরা ৮৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ সিজিএ'র জনবল এখনো ১৯৮৩ সালে 'এনাম কমিটি'র তৈরিকৃত অর্গানোগ্রাম অনুসারেই নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে সীমিত রয়েছে। ২০০৪-০৫ সালে সিজিএ'র একটি নতুন অর্গানোগ্রাম প্রস্তাব করা হলেও তা এখন পর্যন্ত অনুমোদন হয় নি।

বর্তমানে বেশ কিছু পদে নিয়োগের অনুমোদন পাওয়া গেলেও তা ১৯৮৩'র অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী করা হচ্ছে। আবার নিজস্ব নিয়োগ বিধিমালা না থাকায় সিভিল অডিটসহ অন্যান্য বিভাগ যেমন পিটিঅ্যান্ডটি, পূর্তসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বিভিন্নরকম পরিবর্তন আসলেও সিভিল অডিটের নিয়মেই (৭০% নিয়োগ ও ৩০% পদোন্নতি) পদোন্নতি দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে নিয়মিত পদোন্নতি না দেওয়ায় অনেক কর্মচারী পদোন্নতি পাওয়ার যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও পদোন্নতি পাচ্ছে না। ফলে তাদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিচ্ছে যার প্রভাব পড়ছে সিজিএ'র কার্যক্রমের ওপরে।

৩.২.৫ সিএজি, সিজিএ ও অর্থ বিভাগের সমন্বয়ের সমস্যা

বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রের হিসাবরক্ষণের ভার সিএজি'র ওপর ন্যস্ত। ফলে সিজিএ'র অর্গানোগ্রাম, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং ক্ষমতার পরিধি ইত্যাদি বিষয় সুনির্দিষ্ট নয়। সংবিধানে সিজিএ'র দায়-দায়িত্ব, কার্যকাল, প্রতিবেদন উপস্থাপন ইত্যাদি সম্পর্কে আলাদাভাবে কিছু বলা হয়নি। সংবিধানের ১৩১ অনুচ্ছেদে সিএজি'র কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রজাতন্ত্রের হিসাবরক্ষণের আকার ও পদ্ধতি সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। অথচ সংবিধান পরিবর্তন না করেই অর্থ মন্ত্রণালয় তার আদেশ বলে ২০০২ সালে সিজিএ'কে সিএজি থেকে আলাদা করে। ফলে বিভাজন হলেও সিজিএ'কে কোনো কাজ করতে হলে তা সিএজি থেকে আগে অনুমোদন করিয়ে নিতে হয়। আবার সিজিএ অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ অনুসারেও এর সব কার্যক্রম পরিচালনা করে। এভাবে সিজিএ'র কার্যক্রম দ্বৈত নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। সিজিএ সিএজি'র মত স্বাধীনভাবে কাজ করবে নাকি অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে থাকবে তা নির্দিষ্ট করা নেই।

৩.২.৬ জবাবদিহিতায় সমস্যা

অডিট থেকে অ্যাকাউন্টসকে আলাদা করার ফলে সিজিএ'র কার্যক্রম তদারকির জন্য সিএজি দায়িত্বপ্রাপ্ত নয়। সিজিএ'র কার্যক্রম সম্পর্কে অর্থ মন্ত্রণালয়ও অবগত নয়। মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও সিজিএ'র কার্যক্রম মনিটরিং করার মত কোনো সেল বা দক্ষ জনবল অর্থ মন্ত্রণালয়ে নেই। গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দপ্তরগুলোর মধ্যে একটি হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘ সাত মাস যাবত সিজিএ'র পদ খালি। সিজিএ'র কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নিজস্ব কোনো নৈতিক আচরণ বিধি না থাকায় তারা সিএজি'র আচরণ বিধি মেনে চলে। এই আচরণ বিধি পালন করার জন্য কোনো মনিটরিং ব্যবস্থা নেই। কর্মচারীদের অনিয়ম-দুর্নীতির জন্য কর্মকর্তারা কোনো ব্যবস্থা নিতে গেলে কর্মচারী সমিতির প্রভাবে তা করা সম্ভব হয় না। পরিদর্শন ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং দক্ষতা ও শৃঙ্খলা শাখা দুটি দক্ষ কর্মী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সদিচ্ছার অভাবে কার্যক্রম সঠিকভাবে পালন করতে পারে না। উচ্চ থেকে নিম্নপদস্থ সব কর্মকর্তা-কর্মচারী এ অফিসের দুর্নীতি ও হয়রানি সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। অন্যদিকে শাস্তির প্রক্রিয়া দীর্ঘ ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে অপরাধী পার পেয়ে যাওয়ায় কোনো কর্মকর্তাই কারও বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে চায় না। এখানে হয়রানি করা ও ঘুষ আদায়ের জন্য দিনের পর দিন বিল ধরে রাখলেও তা মনিটর করার কেউ নেই এবং এর জন্য কোনোরকম শাস্তি পেতে হয় না।

৩.২.৭ সিজিএ'র কার্যক্রমের ওপর মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গ্রেডিং সমস্যা

সিজিএ কার্যালয় নিজস্ব বিধি-বিধান অনুযায়ী কাজ করতে না পারার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ প্রতিনিয়ত সচিবালয়ের কর্মকর্তা কর্তৃক হস্তক্ষেপ। তারা আর্থিক হিসাবের নিয়ম-কানুন মানতে চায় না। অধিকাংশ সিএও সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের তুলনায় জুনিয়র। সিএও'র এসিআর সিজিএ লিখলেও প্রতিস্বাক্ষর করেন সংশ্লিষ্ট সচিব। সচিবদের প্রিন্সিপাল অ্যাকাউন্টিং অফিসারের ক্ষমতা থাকায় তারা সিএও'র আপত্তিকে উপেক্ষা করতে পারে। সুতরাং অনিবার্য পরিণতি হিসেবে সিএও'র কর্মকাণ্ডে এর প্রভাব পড়ে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অধীন অফিসের বিলে আপত্তি দেওয়ার প্রয়োজন হলেও মন্ত্রী বা সচিবের আদেশে ভুয়া বিল পাস করিয়ে দিতে বাধ্য হয়। এসব অনিয়ম ও ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে পাঠালেও মন্ত্রণালয় থেকে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয় না। জেলা-উপজেলার হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাদেরকেও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও জেলা প্রশাসক (ডিসি)-এর বিলের ক্ষেত্রে একই ধরনের সমস্যায় পড়তে হয়। আবার রাজনীতিকরণের কারণে সিএওদের পদায়নে মন্ত্রী-সাংসদদের প্রভাব থাকায় সিএওরাও অনেক

সময় নিয়ম লঙ্ঘন করে বিল পাশ করে দেয়। অন্যদিকে সিজিএ কার্যালয়ের প্রধান কন্ট্রোলার জেনারেল অফ একাউন্টস বা সিজিএ একজন গ্রেড-২ মর্যাদার কর্মকর্তা। সিজিএ'র পরেই অতিরিক্ত সিজিএ যুগ্ম সচিব (গ্রেড-৩) মর্যাদার না হয়ে গ্রেড-৪ মর্যাদার কর্মকর্তা। সরকারের বিভিন্ন বিভাগে এসএসসি ও এইচএসসি যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীরা দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসেবে পদোন্নতি পেলেও সিজিএ'তে তা করা হয় নাযেখানে নার্স, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, সমবায় অফিসার, সাব রেজিস্ট্রার দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা সেখানে সিজিএ'র অডিটর তৃতীয় শ্রেণীর। এখানে সিলেকশন গ্রেডের সুযোগও বন্ধ রয়েছে।

৩.২.৮ অফিস স্থাপনা ও অন্যান্য লজিস্টিক সাপোর্টের অভাব

অবকাঠামোগত সমস্যা সিজিএ অফিসের অন্যতম সমস্যা। কোনো কোনো প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার অফিসে কর্মচারীদের বসার জায়গা অপ্রতুল। জেলা-উপজেলা পর্যায়ের হিসাবরক্ষণ অফিসেও একই চিত্র পরিলক্ষিত হয়। জেলা-উপজেলা পর্যায়ে হিসাবরক্ষণ অফিসের নিজস্ব কোনো কার্যালয় নেই। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা জেলা প্রশাসকের অফিসেই হিসাবরক্ষণ অফিসগুলো অবস্থিত। দু'তিনটি কক্ষ নিয়ে হিসাবরক্ষণ অফিসের অবস্থান যেগুলোতে জমে আছে রেজিস্ট্রার ও কাগজপত্রের বড় বড় স্তুপ। এই স্তুপ থেকে কোনো কাগজ বের করে কাজ করাও কষ্টকর। রেজিস্ট্রারগুলো ব্যবহার করতে করতে ছিঁড়ে যাচ্ছে। আলমিরাসহ অন্যান্য জিনিসপত্রের অভাবে কাগজপত্র, রেজিস্ট্রার, ফাইলপত্রসহ বিভিন্ন জিনিসপত্র ব্যবস্থাপনা করা যাচ্ছে না। অপরিাপ্ত কম্পিউটার ও লোড শেডিংয়ের কারণে সময়মত সকল কাজ করতে কর্মীরা সক্ষম হয় না।

৩.২.৯ প্রশিক্ষণে সমস্যা

সিজিএ অফিসে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের নিজস্ব কোনো ম্যানুয়াল ও প্রশিক্ষণ সেন্টার নেই। পূর্বে সিএজি'র নিয়ন্ত্রণে সিজিএ অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যেভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হত এখনো সেভাবেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নানা ধরনের সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। চাকরি পাওয়ার পর ফিমা থেকে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ছাড়া আর কোনো প্রশিক্ষণই সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় না। ফিমা থেকে অন্য যেসব প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সেগুলো সিজিএ'র প্রয়োজন অনুসারে হয় না, বরং ফিমা প্রশিক্ষণের বিষয় নির্ধারণ করে সিজিএ'কে জানায়। ফলে কী বিষয়ের ওপরে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে তা অনেক সময় আগে জানানো হয় না। তাছাড়া এখনো পুরনো ধাঁচের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, এবং তা তত্ত্বনির্ভর হওয়ার কারণে বর্তমান কাজের সাথে সংগতিহীন বলে কাজে লাগানো যায় না।

৩.২.১০ নাগরিক সনদে সীমাবদ্ধতা

সিজিএ'র নাগরিক সনদ সিজিএ'র ওয়েবসাইটে সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া রয়েছে। এটি ইংরেজি ভাষায়, ফলে অনেক কর্মচারীর কাছেই বোধগম্য নয়। এর কোনো প্রচারণা না হওয়ায় স্টেকহোল্ডাররা এটি সম্পর্কে অবগত নয়। ফলে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য সিজিএ অফিসে কোনো রকম চাপ সৃষ্টি করতে পারে না। সনদ প্রণয়নের সময় সিজিএ অফিসের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারের অংশগ্রহণ না থাকায় সনদে স্টেকহোল্ডারদের মতামত প্রকাশ পায়নি। এটিতে কোনো তারিখ উল্লেখ না থাকায় কবে হালনাগাদ করা হবে তার কোনো নির্দেশনা নেই।

৪. সিজিএ অফিসের অনিয়ম ও দুর্নীতি

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেওয়া হয়েছে কিনা, ক্রয়ের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বাজেট আছে কিনা, সংশ্লিষ্ট নিয়ম মানা হচ্ছে কিনা এবং মঞ্জুরি আছে কিনা ইত্যাদি বিষয় নিরীক্ষা করে এ অফিস বিল অনুমোদন করে থাকে। যেসব বিলে কোনো সমস্যা থাকে না সেগুলোকে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে পাস করে চেক ডেলিভারি দেওয়া, আর যেসব বিল নিয়মমার্কিত হয়নি সেগুলোর ওপরে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপত্তি দিয়ে সংশ্লিষ্ট অফিসে পাঠিয়ে দেওয়াই হচ্ছে নিয়ম। কিন্তু এই কাজ করতে গিয়ে সিজিএ অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একটি অংশ অনিয়ম ও দুর্নীতির আশ্রয় নেয় এবং সরকারি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হয়রানি করে। নিম্নে সেবাগ্রহীতারা সিজিএ অফিস থেকে কী ধরনের হয়রানি ও দুর্নীতির শিকার হয় সেগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

৪.১ নিয়োগ, পদায়ন ও বদলিতে অনিয়ম ও দুর্নীতি

সিজিএ অফিসে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদায়ন ও বদলির ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেন, রাজনৈতিক প্রভাব খাটানো এবং স্বজনপ্রীতি করা হয়। কর্মচারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে সিজিএ ও কর্মচারী সমিতির নেতাদের মধ্যে দর-কষাকষি চলে। কতজন দলীয় লোক নিয়োগ দিতে হবে তা কর্মচারী সমিতি নির্ধারণ করে দেয়। সিজিএ তাতে রাজি না হলে কখনোই এই নিয়োগ সম্ভব নয়। আর যারা কর্মচারী সমিতির সুপারিশ নিয়োগপ্রাপ্ত হয় তাদের প্রত্যেককেই ঘুষ দিতে হয়। এ ধরনের নিয়োগের জন্য মন্ত্রীদের মাধ্যমে তদবিরও করানো হয়। ঘুষ দিয়েও এ তদবির করা হয়। এক্ষেত্রে এক লক্ষ টাকার ওপরেও ঘুষ লেনদেন হয়ে থাকে।

স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্বরাষ্ট্র, এলজিইডি, কৃষি, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য যেসব মন্ত্রণালয়ের আর্থিক লেনদেন, বাজেট, অফিস, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও প্রকল্পের সংখ্যা বেশি সেসব মন্ত্রণালয়ের সিএও অফিসে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পদায়ন পাওয়ার জন্য মন্ত্রী-সাংসদদের মাধ্যমে সুপারিশ করানো এবং ঘুষ দিয়ে থাকে। ফলে অবৈধ পন্থায় পদায়িত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষমতার অপব্যবহার করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার ব্যাপক প্রবণতা থাকে। বদলির ক্ষেত্রে রাজনীতিকরণ এতই বেশি যার প্রমাণ অনেক হিসাবরক্ষণ অফিসে পদ না থাকার পরও অতিরিক্ত কর্মী থাকা। আবার অনেক জায়গায় পদ থাকলেও কর্মী নেই। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বিভাগীয় পর্যায়ে প্রথম শ্রেণীর ৩৮টি পদের বিপরীতে কর্মরত ৪১ জন।

রাজশাহীতে ৩২৩টি পদ থাকলেও সেখানে অতিরিক্ত কর্মরত রয়েছে ৫১ জন। আবার সিলেটে ৯৯ জনের জায়গায় কর্মরত রয়েছে ৭৩ জন।

৪.২ নতুন বেতন স্কেল সংযোজনে (Fixation) দুর্নীতি

নতুন বেতন স্কেলে বেতন পেতে হলে হিসাবরক্ষণ অফিসের মাধ্যমে প্রতিটি কর্মকর্তা কর্মচারীর নামে তা সংযোজন করা প্রয়োজন। নতুন বেতন স্কেল ঘোষণার এক মাসের মধ্যেই সিজিএ অফিসে তা সংযোজন হয়ে যাওয়ার কথা থাকলেও গবেষণায় দেখা যায়, ২০০৯ সালের ঘোষিত বেতন স্কেল পেতে যেসব অফিস দ্রুত ঘুষ দিতে পেরেছে সেসব অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতন স্কেল ঘোষণার পরবর্তী মাসেই সন্নিবেশন হয়ে গেছে। আর যাদের ঘুষ দিতে দেরি হয়েছে তাদের নতুন বেতন স্কেল সংযোজন হতেও দেরি হয়েছে। যারা ঘুষের বিনিময়ে তাদের বেতন স্কেল সংযোজন করেছেন তাদের জনপ্রতি সাধারণত সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয়েছে। কোনো কোনো সরকারি অফিসের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ঘুষ দিতে রাজি না হওয়ায় ২০১০ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসেও অনেকের নতুন বেতন স্কেল সংযোজন হয়নি। যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিয়োগে জটিলতা, স্বজনপ্রীতি কিংবা অনিয়ম রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে নতুন বেতন স্কেল সংযোজন করতে সবচেয়ে বেশি ঘুষ দিতে হয়। এ ধরনের কর্মচারীদের কাছ থেকে ২,০০০ টাকা পর্যন্ত ঘুষ নেওয়া হয়, এবং এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সিজিএ কর্মী নিজেই সমস্ত কাগজপত্র তৈরি করে জমা দেয়।

৪.৩ প্রথম বেতন ও বোনাস পেতে দুর্নীতি

চাকরি পাওয়ার পরে প্রথম বেতন তুলতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হয়রানির শিকার হওয়া নিয়মিত ঘটনা। এ সময় বিভিন্ন কাগজপত্র চেয়ে হয়রানি করা হয়, কিন্তু ঘুষ দিলে খুব সহজেই কাজ হয়ে যায়। প্রথম বেতন উত্তোলনের ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের তুলনায় কর্মচারীদের বিশেষ করে প্রকল্পের কর্মচারীদের হয়রানি বেশি করা হয়। আবার বোনাস উত্তোলনের সময় অনেকগুলো টাকা একসাথে দেওয়া হয় বলে এ সময়ে সিজিএ কর্মীরা কিছু উপরি আয়ের চেষ্টা করে।

৪.৪ প্রকল্প ও ঠিকাদারের বিলে দুর্নীতি

সিজিএ অফিসে দুর্নীতির সবচেয়ে বড় উৎস হচ্ছে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের বিল। প্রকল্পের বিল অনুমোদন করার ক্ষেত্রে সিজিএ অফিসে কিছু নিয়ম-কানুন অনুযায়ী যাচাই-বাছাই করে থাকে, যেমন চুক্তিতে উল্লিখিত অর্থের পরিমাণের অতিরিক্ত বিল পেশ করা হয়েছে কিনা, বিলটি সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত কিনা, বছরের বাজেটে খাত অনুযায়ী বরাদ্দ আছে কিনা, সংশ্লিষ্ট মঞ্জুরি প্রদানকারী অফিসের অনুমোদন আছে কিনা, ক্যাশে টাকা আছে কিনা, ডিডিও'র স্বাক্ষর রয়েছে কিনা, সরকারের ভ্যাট ও ট্যাক্স কাটা হয়েছে কিনা ইত্যাদি। এসব কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে ঠিকাদাররা ঘুষের মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলন করে নিতে সমর্থ হয়। আবার দেখা যায় সব নিয়ম-কানুন মেনে প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র সরবরাহ করা সত্ত্বেও ঠিকাদারদের ঘুষ দিতে হয়। এক্ষেত্রে ঘুষ সাধারণত শতকরা হারে দিতে হয়। বিলের পরিমাণ এক লক্ষ টাকার নিচে হলে ঘুষ দিতে হয় ৫% থেকে ১০%। বিল এক লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষের মধ্যে হলে ১% থেকে ১.৫% ঘুষ নেওয়া হয়। আর বিল পাঁচ লক্ষের বেশি এবং ২০ লক্ষের মধ্যে হলে ০.৫০% থেকে ১% পর্যন্ত ঘুষ নেওয়া হয়। কোটি টাকা বা এর বেশি বিল হলে ০.২০% থেকে ০.৫০% পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয়। এই ঘুষের হার মে-জুন মাসে আরও বেশি হয়ে যায় এবং ১০% পর্যন্ত পৌঁছায়। আবার ঈদ বা পূজার সময়ও বেশি হারে ঘুষ দিতে হয়।

৪.৫ ভ্রমণ ও দৈনিক (টিএ, ডিএ) ভাতা বিলে দুর্নীতি

ভ্রমণভাতা বিলের ক্ষেত্রে দেখা যায়, এমন কোনো অফিস নেই যেখানে টিএ, ডিএ বিল পাস করাতে দুর্নীতির শিকার হতে হয় না। বিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, বিল দিতে দেরি হবে, অন্য কাজে ব্যস্ত, বিলের সাথে প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র সরবরাহ করা হয়নি, বিলে কাটাকাটি হয়েছে ইত্যাদি কারণ দেখিয়ে বিল আটকে রাখাসহ বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হয়। আবার ঘুষ দিলে খুব সহজেই সে বিল পাশ হয়ে যায়। এই খাতে ঘুষের পরিমাণ সাধারণত ১% থেকে ১০% পর্যন্ত ওঠানামা করে। আবার কখনো খোক ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ৫০০ টাকা, ১০০০ টাকা বা তার থেকেও বেশি ঘুষ দিতে হয়। অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীই প্রাপ্যের বেশি পরিমাণ বিল করে ঘুষের মাধ্যমে পাশ করিয়ে নেয়।

৪.৬ আনুষঙ্গিক (কন্টিনজেন্সি) বিলে দুর্নীতি

আনুষঙ্গিক খাতে বিল বাড়িয়ে লেখার সুযোগ অনেক বেশি থাকায় এই বিলে সর্বোচ্চ ঘুষ নেওয়া হয়। যেসব অফিসে আনুষঙ্গিক খাতে বরাদ্দ বেশি সেখানে ঘুষ লেনদেনও বেশি। সাধারণত আনুষঙ্গিক বিল পাস করাতে বিলের ১% থেকে ৫% পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয়। তবে কখনো কখনো বিলের অংক বড় হলে বিলের ৩% থেকে ৭% পর্যন্ত, বিলের পরিমাণ এক লক্ষ টাকার মধ্যে হলে ১% এবং এর অধিক হলে বিলের ০.২০% থেকে ০.৫০% পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয়।

৪.৭ পেনশন পেতে দুর্নীতি

পূর্বের তুলনায় হয়রানি কিছুটা কম হলেও ঘুষ না দিয়ে পেনশন উত্তোলন করা সম্ভব নয়। সরকারি কর্মচারীদের সারা জীবনের বেতন নির্ধারণ ও বেতন-ভাতা পরিশোধ হিসাবরক্ষণ অফিস করলেও দেখা যায় চাকরিজীবনের শেষে পেনশন ও আনুতোষিক প্রদানের প্রাক্কালে আবার বেতন নির্ধারণী যাচাই করা হয়, এবং অতিরিক্ত টাকা উত্তোলন করা হয়েছে যা ফেরতযোগ্য বলে হয়রানি করা হয়।

আবার ঘুষ দিলে পেনশনের ফেরতযোগ্য বলে কিছু থাকে না। উত্তোলনের পূর্বেই যদি দর-কষাকষি করে একটি সমঝোতায় আসা যায় তাহলে পেনশন পেতে কোনো হয়রানির সম্মুখীন হতে হয় না। প্রয়োজনীয় সকল নথি-পত্র সিজিএ অফিসের কর্মচারীরাই সরবরাহ করে কম সময়ের মধ্যে পেনশন পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়। আবার সঠিকভাবে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়েও ঘুষ নিয়ে সমঝোতায় না আসলে বিভিন্ন নিয়ম-কানুন দেখিয়ে বিল ফেলে রাখা, আপত্তি তুলে ফিরিয়ে দেওয়া, সব আপত্তি একসাথে না দিয়ে বার বার আপত্তি দেওয়া, সার্ভিস রেকর্ডে সমস্যা রয়েছে ইত্যাদি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় হয়রানি করা হয়। বিলের ওপরে বিভিন্ন আপত্তি দিয়ে আবার নিজেরাই ঘুষের বিনিময়ে তার ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য পরামর্শ দেয়।

সাধারণত পেনশন বিলের ১% থেকে ১০% পর্যন্ত ঘুষ হিসেবে দিতে হয়, আবার থোক হিসেবে দিলে ৫,০০০ টাকা থেকে শুরু করে প্রায় ৫০,০০০ টাকা পর্যন্তও ঘুষ দিতে হয়। তবে যাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা থাকে তাদের ঘুষের পরিমাণ সবসময় বেশি হয়ে থাকে।

৪.৮ ঋণ ও জিপিএফ অ্যাকাউন্ট স্লিপ পাঠানো ও এই ফান্ডের টাকা অগ্রিম উত্তোলনে ঘুষ

জিপিএফ অ্যাকাউন্ট স্লিপ ১ জুলাই হতে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রত্যেক সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী বরাবর পৌঁছানোর নিয়ম থাকলেও কিছু কিছু প্রধান হিসাবরক্ষণ অফিস জিপিএফ অ্যাকাউন্ট স্লিপ কখনোই নিজ থেকে না পাঠানোর কারণে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিজেদের এসে স্লিপ নিতে হয়। আর কাউকে নিজ থেকে জিপিএফ অ্যাকাউন্ট স্লিপ নিতে হলেই এর জন্য বকশিশ বা ঘুষ দিতে হয়। সাধারণত জিপিএফ অ্যাকাউন্ট স্লিপ নেওয়ার জন্য ১০০ টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয়। অন্যদিকে জিপিএফ ব্যালান্স স্থানান্তর ও জিপিএফ অগ্রিম উত্তোলন বা চূড়ান্ত পরিশোধ বিল জমা দেওয়ার তারিখ থেকে তিন কর্মদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি করার কথা থাকলেও এই টাকা উত্তোলনে ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয়।

৪.৯ অনিয়ম ও দুর্নীতির সার্বিক চিত্র

ওপরে উল্লিখিত খাতগুলো ছাড়াও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বিভিন্ন বিল বা অন্যান্য কাজ করানোর জন্য সিজিএ অফিসে গিয়ে থাকে এবং হয়রানি ও দুর্নীতির শিকার হয়। সিজিএ অফিসে সেবা নিতে গিয়ে ২৩টি খাতে ঘুষ দিতে হয় বলে গবেষণায় উঠে এসেছে (সারণি ১)।

সারণি ১: সিজিএ অফিসে সেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির সার্বিক চিত্র

	সেবার খাত	ঘুষের পরিমাণ (টাকায়)
১	নতুন বেতন স্কেল সংযোজন	২০-২০০০ টাকা
২	প্রথম বেতন উত্তোলন	১০০-২০০ টাকা
৩	বোনাস উত্তোলন	১০০-২০০ টাকা
৪	ঠিকাদারের বিল উত্তোলন	বিলের ০.২০%- ১০%
৫	গাড়ির তেল/গ্যাস ও রক্ষণাবেক্ষণে বিল উত্তোলন	বিলের ১% - ১০%
৬	ইন্টারনেট ও টেলিফোন বিল উত্তোলন	বিলের ২%
৭	ক্যুরিয়ার বিল উত্তোলন	বিলের ১%-৫%
৮	শ্রমিক মজুরির বিল উত্তোলন	বিলের ১%
৯	টিএ, ডিএ বিল উত্তোলন	বিলের ১% - ১০% বা ৫০ -১০০০ টাকা
১০	কন্টিনজেন্সি বিল উত্তোলন	বিলের ০.২০% - ৭%
১১	পেনশন উত্তোলন	বিলের ১% - ১০%
১২	টাইম স্কেল সংযোজন করানো	৩০০-১০০০ টাকা
১৩	কর্মচারীর চাকরি স্থায়ীকরণ	৫০-১০০ টাকা
১৪	বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট উত্তোলন	৫০০-১০০০ টাকা
১৫	এলপিসি উত্তোলন	১০০-৫০০ টাকা
১৬	জিপিএফ অ্যাকাউন্ট স্লিপ	২০-১০০ টাকা
১৭	জিপিএফ এর টাকা অগ্রিম উত্তোলন	৫০০-৫০০০ টাকা
১৮	কনসালটেন্ট এর বিল উত্তোলন	বিলের ১০%-১৫%
১৯	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা উত্তোলন	৫০-২০০ টাকা
২০	পোশাক ভাতা উত্তোলন	বিলের ১০%
২১	কম্পিউটারে বিল এন্ট্রি করানো	১০-২০ টাকা
১৬	জিপিএফ অ্যাকাউন্ট স্লিপ	২০-১০০ টাকা

১৭	জিপিএফ এর টাকা অগ্রিম উত্তোলন	৫০০-৫০০০ টাকা
১৮	কনসালটেন্ট এর বিল উত্তোলন	বিলের ১০%-১৫%
১৯	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা উত্তোলন	৫০-২০০ টাকা
২০	পোশাক ভাতা উত্তোলন	বিলের ১০%
২১	কম্পিউটারে বিল এন্ট্রি করানো	১০-২০ টাকা
২২	চেক ডেলিভারি করানো	২০-৫০ টাকা
২৩	ভুল সংশোধন	৫০-৫০০ টাকা

গবেষণার তথ্য সংগ্রহের সময় সিজিএ অফিসের বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারী ঘুষ নেওয়ার কথা স্বীকার করে এবং এর স্বপক্ষে যুক্তি তুলে ধরে। তাদের মতে যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিল পাস করাতে ঘুষ নেওয়া হয় সেসব সেবাগ্রহীতা অফিস বা ব্যক্তির বিলে নিশ্চয়ই কোনো সমস্যা থাকে। এ কারণে তারা ঘুষ দিয়ে বড় বড় দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের ঘটনা গোপন করার চেষ্টা করে।

৫. সুপারিশ

সিজিএ অফিসের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও সুশাসন সংক্রান্ত সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য নিচের সুপারিশসমূহ প্রস্তাব করা হল।

৫.১ নীতিগত উদ্যোগ

১. সংবিধান সংশোধন করে সিজিএ'কে একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা দিতে হবে।
২. সিজিএ অফিসকে দ্বৈত ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণ থেকে বের করতে হবে, অর্থাৎ সিজিএ সিএজি না অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে থাকবে তা নির্দিষ্ট করতে হবে।
৩. সিজিএসহ সকল পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদমর্যাদা বৃদ্ধি করতে হবে। এক্ষেত্রে সিজিএ'র পদটি গ্রেড ১ করার মাধ্যমে নিম্নের অ্যাডিশনাল সিজিএ, সিএও, এএও, সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও অডিটরদের গ্রেড বৃদ্ধি করতে হবে।
৪. সিজিএ অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য একটি নৈতিক আচরণ বিধি প্রণয়ন করতে হবে। এর সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করতে যোগ্য ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে একটি 'নৈতিকতা কমিটি' গঠন করতে হবে। দুর্নীতি ও অনিয়মসহ সকল প্রকার নৈতিক আচরণ বিধি লঙ্ঘনকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সিজিএ অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এই কমিটির নিকট তাদের অভিযোগ দাখিল করবেন এবং কমিটি তা যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।

৫.২ সেবাগ্রহীতাদের সংক্ষুদ্বি (grievance) প্রশমন সংক্রান্ত

৫. দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত সিজিএ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে।
৬. সিজিএ অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি সম্পর্কে অভিযোগ করার জন্য সিজিএ'তে একজন ন্যায্যপাল নিয়োগ করতে হবে। যেকোনো সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী তাদের সমস্যা নিয়ে এই ন্যায্যপালের কাছে অভিযোগ দাখিল করতে পারবে এবং ন্যায্যপাল তার সুষ্ঠু সমাধান দেবে।

৫.৩ অবকাঠামো ও লজিস্টিক সংক্রান্ত

৭. সিজিএ অফিসের সকল কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয় (অটোমেটেড) ব্যবস্থাপনার আওতায় নিতে হবে। উপজেলা পর্যায়ের অফিসগুলোকেও স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসতে হবে। প্রতিটি সরকারি অফিসের সাথে সিজিএ অফিসের হিসাবের লিঙ্ক থাকতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও বাজেট নিশ্চিত করতে হবে।
৮. সিজিএ অফিসের কাজে যাতে কোনো রকম ব্যাঘাত না ঘটে সেজন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে হবে।
৯. জেলা ও উপজেলা পর্যায়সহ ঢাকা অফিসেও কাগজপত্র রাখার জন্য রুম, শেলফ, সরকারি ফরম, লেজার, অ্যাকাউন্ট স্লিপ ইত্যাদিসহ অন্যান্য লজিস্টিক বাড়াতে হবে।

৫.৪ অর্গানোগ্রাম ও জনবল সংক্রান্ত

৯. বর্তমানে প্রয়োজনীয় জনবলের ভিত্তিতে সিজিএ অফিসের অর্গানোগ্রাম নতুন করে প্রণয়ন করতে হবে।
১০. স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে কাজ করার জন্য কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন জনবল বৃদ্ধি করতে হবে। সব শূন্যপদে দ্রুত নিয়োগ দিতে হবে।
১১. সিজিএ অফিসে কর্মচারীদের পদোন্নতি নিয়ে যে জটিলতা রয়েছে তার দ্রুত সমাধান করে যোগ্য কর্মচারীদের পদোন্নতি দিতে হবে। তিন বছর পর পর পদোন্নতির যে বিধান রয়েছে তা কার্যকর করতে হবে।
১২. এএওদের (নন ক্যাডার) পদোন্নতির সংখ্যা ২০% করতে হবে।
১৩. নিয়োগ সংক্রান্ত নতুন বিধিমালা অনুমোদন দিতে হবে। নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা নিশ্চিত

করার ক্ষমতা সিজিএ'র থাকতে হবে।

১৪. রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হিসাবরক্ষণ অফিসগুলোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১৫. সিজিএ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত নতুন বিধিমালা অনুমোদন দিতে হবে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের সাথে মিল রেখে যুগোপযোগী ও নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরে তা সঠিকভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে কি না তা যাচাই-বাছাই করতে হবে। প্রতিটি বিভাগীয় পর্যায়ে একটি করে প্রশিক্ষণ সেন্টার গঠন করতে হবে।

১৬. যে ব্যক্তির যে কাজে বেশি দক্ষতা রয়েছে তাকে সেখানে কাজে লাগাতে হবে। বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পর্যায়ক্রমে নির্বাচন করতে হবে।

১৭. বিদেশে মিশন অডিট করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ দিতে হবে।

৫.৬ তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত

১৮. বছরে একবার সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সম্পদের হিসাব ও বিবরণ প্রকাশ করতে হবে এবং তা যাচাই করতে হবে। বৈধ সূত্রের বাইরে অন্যান্য উৎস থেকে অর্জিত আয় বা সম্পদ আহরণ বা অন্য কোনোরূপ দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গেলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৯. সেবা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংযোজন করে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মতামতের ভিত্তিতে নাগরিক সনদটিকে পুনঃপ্রণয়ন করতে হবে। অভিযোগ দাখিল ও তার ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এতে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য থাকতে হবে এবং হালনাগাদ করতে হবে। প্রতিটি সরকারি অফিসে এই নাগরিক সনদ পৌঁছে দিতে হবে।

২০. সকল আইন সম্পর্কে অবগত করার জন্য আইন এবং আইনের সংশোধনগুলো একত্রিত করে বই আকারে প্রকাশ করতে হবে।

৫.৭ কার্যক্রম মনিটরিং সংক্রান্ত

২০. সিজিএ'র জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ও কার্যক্রম মনিটর করার জন্য দক্ষ জনবলের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ে একটি সেল বা উইং গঠন করতে হবে।

২১. অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে জুন মাসে সারা বছরের ২৫% এর বেশি বিল না পাঠানোর নির্দেশ দিতে হবে।

২২. সিজিএ থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তারা যাতে প্রতিটি বিভাগের কার্যক্রম সার্বক্ষণিক মনিটর করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী নির্দিষ্ট সময়ের বেশি সময় বিল আটকে রাখলে তার জন্য সিজিএসহ অন্যান্য কর্মকর্তা তাকে ডেকে ব্যাখ্যা চাইবেন।

২৩. 'পরিদর্শন-অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ' শাখা ও 'দক্ষতা-শৃঙ্খলা' শাখায় দক্ষ জনবল নিয়োগ করে এ শাখাগুলোকে আরও কার্যকর করতে হবে। একইসাথে পরিদর্শন ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ শাখা এবং দক্ষতা-শৃঙ্খলা শাখার মধ্যে সমন্বয়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

২৪. 'বিধি-পদ্ধতি' শাখা ১ ও ২-কে একত্র করে একটি শাখায় পরিণত করতে হবে এবং এ শাখাটিকে দক্ষ জনবল ও অন্যান্য লজিস্টিক সুবিধা দিয়ে কার্যকর করতে হবে।

৫.৮ হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত (দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা)

২৫. ধীরে ধীরে অ্যাক্রুয়ালভিত্তিক হিসাবরক্ষণের দিকে অগ্রসর হতে হবে। উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের এ ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং তা প্রয়োগে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে। এ পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ নিশ্চিত করতে হবে। আর্থিক বিবরণ উপস্থাপনে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহকে অ্যাক্রুয়াল ভিত্তিতে উপস্থাপন করতে হবে। এর জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। আর্থিক বিবরণ তৈরীর প্রশিক্ষণের সাথে সাথে তা বিশ্লেষণ পদ্ধতি সম্পর্কেও প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।